নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৯, পৃ : ৪৯-৬৯
© ২০০৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

লোকজ বিশ্বাস ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার চিরায়ত অনুশীলনঃ একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

মুহাম্মদ আলা উদ্দিন*

১. ভূমিকা

মানব সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য। সংস্কৃতির বৈভিন্ন্যতা পাঠ নৃবিজ্ঞানকে অনন্যতা দান করেছে। কোন সংস্কৃতির স্বরূপ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিস্ফুট হয়। তাই সংস্কৃতি অধ্যয়নে নৃবিজ্ঞানীগণ জনসাধারণের স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনরীতিকে প্রাধান্য দেন। সহজ সরল ও অক্ষরজ্ঞানহীন সমাজ অধ্যয়ন এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব পায়। চিরায়ত জীবনাচার, বিশ্বাস ও প্রথার চিত্রায়ণে নৃবিজ্ঞানীগণ ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষভাবে মনযোগী। সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত এই উভয় দিকই নৃবিজ্ঞানীদের নিকট সমান গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানীরা সমাজের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে অধ্যয়ন করছেন। আবহমান গ্রাম বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা লোকজ সংস্কৃতি এতে প্রাধান্য পায়। অদ্যাবধি সাধারণ জনগোষ্ঠীর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও জাগতিক বিশ্বাস ব্যবস্থা বিষয়ক গবেষণা কর্মের সংখ্যা এক্ষেত্রে অপ্রতুল।

বাংলাদেশ একটি 'উন্নয়নশীল' দেশ। এই দেশের চিকিৎসাসেবা জনসাধারণের নিকট এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ততা লাভ করেনি। সরকার গত শতকের শেষ অবধি (২০০০ সালের মধ্যে) সবার জন্যে স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট ন্যূনতম প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়া সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যনীতির মূল্য লক্ষ্য ছিলো। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নিলেও বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি এবং সরকার লক্ষ্য সময়সীমার মধ্যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে নীতিগত যেমনি সমস্যা রয়েছে

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

তেমনি সমস্যা রয়েছে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার ষিয়টি। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম একটি সীমাবদ্ধতা হলো মানব জীবনের স্বাস্থ্য ও অসুস্থ্যতার সাথে সম্পর্কিত প্রচলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্বিক বিষয়গুলো বিবেচনায় না আনা। অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো যেমন, প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতি, বিদ্যমান বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কার যা রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা কার্যক্রম তথা স্বাস্থ্য পরিচর্যায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেগুলোও উপেক্ষিত থেকেছে।

এই প্রবন্ধ মূলত এই বিশেষ দিকটির দিকে লক্ষ্য রেখে আবহমানকালের গ্রাম-বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে অনুশীলিত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় লোকজ বিশ্বাস বিশেষ করে লোকজ জ্ঞাননির্ভর ঔষধি বৃক্ষের (medicinal plant) ওপর ব্যপৃত। ঔষধি বৃক্ষের ব্যবহার ও প্রসার ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে সিদ্ধতা লাভ করলেও গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবহারে এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অপেক্ষা বরং বেশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে গুরুত্ব পায় চিরায়ত বিশ্বাস ব্যবস্থা। প্রবন্ধটি ভূমিকা ও উপসংহার বাদে তিনটি মূল অংশে বিভাজিত থাকবে। প্রথম অংশে লোকজ জ্ঞান (Indigenous Knowledge) ও বিশ্বাস সংক্রান্ত কিছু গবেষণা কর্মের ওপর সম্যক পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি, দ্বিতীয় অংশে গ্রামীণ সমাজে স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচলিত বিশ্বাস ও সচেতনতা, এবং তৃতীয় অংশে থাকছে লোকজ স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি জনগোষ্ঠীর মনোভাব সম্পর্কিত আলোচনা।

২.১ তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ও গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা

'আধুনিক' শিল্পায়িত সমাজের মানদণ্ডে পশ্চাদপদ গ্রামীণ সংস্কৃতি অধ্যয়নে অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, এমনকি নৃবিজ্ঞানীগণও ঐসব লোকালয়ের জনসাধারণের অবস্থানকে মূল্যবোধ আরোপিত প্রত্যয় যেমন- 'পশ্চাদমুখী', 'আদিম', 'গ্রাম্য', 'উপজাতি', 'অক্ষরজ্ঞানহীন সমাজ' বা 'গোষ্ঠী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং তাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ব্যবস্থা ও জীবনাচরণকে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন, 'অযৌক্তিক' এবং 'সনাতনী' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বাস ব্যবস্থার মানদণ্ডে যাচাই করার প্রবণতা দেখালেও প্রচ্ছন্নভাবে উন্নয়নের প্রশ্নে তাদের নিজ সমাজের প্রাযুক্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যৌক্তিক আচরণ, উন্নত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগত ভাবাদর্শের অনুসরণের অপরিহার্যতাকে অনগ্রসর সমাজগুলোর পরিবর্তনের প্রয়োজনে বিভিন্ন উন্নয়ন তত্ত্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐ উন্নয়ন তত্ত্বসমূহ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মডেল, রাজনীতিতে পশ্চিমা গণতন্ত্রের

অনুকরণ, সমাজিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমের বিভাজন এবং পশ্চিমা ধাঁচের আমলাতন্ত্রের অনুসরণে যৌক্তিক আচরণ (rational behavior) ও যৌক্তিক আধুনিক মূল্যবোধের প্রচলনকে কেবলমাত্র উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসাবে তাত্ত্বিকভাবে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি, বরঞ্চ স্থানে স্থানে অনিবার্য জ্ঞানকরে বৈধতাও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমাজের উঁচু স্তরের (top) মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তৃণমূল জনগোষ্টীর (grassroots) মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ঐ সকল মডেলের অধীনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে তথা উন্নয়নের ব্যর্থতার কারণে নৃবিজ্ঞানে, বিশেষ করে ফলিত নৃবিজ্ঞানে নীচ-উপর (bottom-up) অর্থাৎ নীচ থেকে উন্নয়ন (development from below) দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ গ্রহণযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এই প্রেক্ষিতেই গত শতকের মাঝামাঝি থেকে নৃবিজ্ঞানে একটি নতুন তত্ত্বীয় ধারার আবির্ভাব ঘটেছে যা লোকজ জ্ঞান বা লোকায়ত জ্ঞান (Indigenous Knowledge) হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। একটি সমাজের স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল সমস্যা/ইস্যু বিদ্যমান তা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ লোকসাধারণের জ্ঞান অনুসন্ধান করা এ নতুন মডেলটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এ মডেলের অনুসারীরা মনে করেন যে, সাধারণ লোকেরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞাতার কারণে এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিবিড় সম্পৃক্ততার কারণে কেবল তাদের সমস্যাবলীই নয়, প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাকেও বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখে এবং এই ধারণায় বশবর্তী হয়ে গবেষকগণ নিজেদের দৃষ্টিকোণকে পরিহার করে বিশেষ ঘটনা/সমস্যাকে ঐ সকল সমাজের বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালান। নৃবিজ্ঞানে এ ধারাটি সাম্প্রতিককালে খুব করে চর্চিত হচ্ছে। গবেষণার ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়কে জানার জন্য এবং সত্য অনুসন্ধানের কারণে গবেষক তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ পরিহার করে স্থানীয়দের দৃষ্টিকোন থেকে (এমিক দৃষ্টিকোন) যে বিশ্লেষণ প্রদান করা হয় তা অধিক গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং তা তাদের উন্নয়নে অধিক কার্যকরি হয়। এদিক থেকে লোকজ জ্ঞানব্যবস্থা হচ্ছে মূলত কোন সমাজের জনসাধারণের চিন্তন প্রকৃয়ার প্রবল বিশ্বাস ব্যবস্থা। একে বিশ্লেষণ করলে এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যা ঐ সমাজের বস্তবতার নিরিখে স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক। নৃবিজ্ঞানী বোয়াস তার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদে (cultural relativism) এই দৃষ্টিকোণটিরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। লোকজ জ্ঞানব্যবস্থা প্রকারান্তরে সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ

তত্ত্বের একটি সম্প্রসারিত প্রকাশ। এই তত্ত্বীয় মডেলটির ব্যবহারে কোন সমাজকে শুধু অনুধাবনই নয় বরং সমাজ পরিবর্তনের জন্য এর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগিকতাও রয়েছে।

নৃবিজ্ঞানে লোকজ সংস্কৃতির অনুশীলন দীর্ঘদিন থেকে গবেষণার অন্যতম একটি ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হলেও প্রথাগত নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের স্বজাত্যবোধের প্রবণতা লক্ষণীয়। নৃবিজ্ঞানীরা অগ্রসর, প্রযুক্তিগতভাবে অনুন্নত কিংবা অক্ষরজ্ঞানহীন সমাজের চিত্রায়ণে যে প্রত্যয় ব্যবহার করেন তা উপরিউক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করে। 'আদিম অধিবাসী' 'উপজাতি' 'বর্বর' 'বন্য' 'পশ্চাদমুখী সমাজ' নামকরণে নৃবিজ্ঞানীরা নিজেদের উৎকৃষ্ট ও আপেক্ষিকভাবে উন্নত সমাজের মানদণ্ডে ঐ প্রত্যয়ন করেন। উত্তরাধুনিকতাবাদীগণ পশ্চিমা সমাজ লালিত নৃবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব নির্মাণে ও এথনোগ্রাফী রচনায় এ পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর সমালোচনার সন্মুখীন করেছেন। দেরিদা, ক্লিফোর্ড, গিয়ার্জ প্রমুখ এই সকল প্রশ্নে চরম অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে পশ্চিমা সমাজের চোখে দেখা পূর্বদেশীয় সমাজের বিশ্লেষণে কেবল পক্ষপাতই নয় বরং বর্ণবাদীদের মত উৎকৃষ্ট চিন্তাধারার ক্ষমতা গ্রহণকারী একক শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের তত্ত্বে তথাকথিত বর্বর ও অনুন্নত সমাজের বৈশ্বিক জ্ঞান কিংবা প্রকৃতি বিষয়ক বিশ্লেষণ সবকিছুই অযৌক্তিক ও কুসংস্কার মনের অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে লোকজ সংস্কৃতির ধারণা ও ভাবনাচিন্তাকে কুসংস্কার/অনুর্বর হিসেবে বিবেচনা না করে বিজ্ঞানের সমান্তরাল জ্ঞান, যুক্তিসঙ্গত, অর্থবহ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ এক ধরনের বিশেষ 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' হিসেবে দেখবার পক্ষপাতি। এ তাত্ত্বিক রূপরেখার অনুসরণে কৃষিকর্মে ব্যবহৃত জ্ঞান, ধর্ম ও সমাজ জীবনে লোকজ বিশ্বাস, লোকজ চিকিৎসা, ভেষজ ঔষধাবলীর ব্যবহার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ব্যবস্থায় প্রোথিত রয়েছে নিবিড় সত্যের অবস্থান যা কিনা যুগ-যুগান্তরে মানব স্বার্থের অনুকূলে ক্রিয়াশীল।

পাকিস্তানের সিন্ধুনদের অববাহিকায় পরিচালিত গবেষণায় রিচার্ড কুরিন (১৯৭৯) দেখিয়েছেন যে, ঐ অঞ্চলের কৃষকেরা প্রকৃতিনির্ভর এবং কোন ঋতুতে কী ধরনের ফসল কিংবা কোন ফসল কোন ধরনের ভূমিতে অধিক শস্য উৎপাদনে সক্ষম এ সম্পর্কে তারা বাস্তব জ্ঞান রাখে। যা কৃষিবিজ্ঞানে গবেষণাগারে প্রাপ্ত

ফলাফল থেকে কোন অংশে গুরুত্বহীন নয়। কুরিন দেখিয়েছেন কৃষাণ-কৃষাণী জমির মাটির রং, ধরন, পানির উৎসের ধরন (সামুদ্রিক লোনা পানি, পুকুরের পানি, নলকূপের লৌহ মিশ্রিত পানি) এ সবের গুণাবলীর সঠিক ব্যবহারবিধির জ্ঞান রাখে। ঘরের আঙিনা কোন ধরনের উদ্যানচাষে অধিক উপযোগী (লাউ গাছ, সীম গাছ কিংবা কলা গাছ) এবং কী কারণে ঐ আঙ্গিনায় ভূমির উর্বরতা বেশি জৈবসার, আবর্জনা, গৃহপলিত গবাদীপশু, গাছ-গাছালি কিংবা বর্জ্য ইত্যাদি জৈব প্রক্রিয়ায় তৈরি হিউমাস খোলা জমি থেকে অনেক বেশি উর্বর তা তাদের জ্ঞানভাণ্ডারে রয়েছে। যদিও এদের অধিকাংশের কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান নেই এবং তারা তথাকথিত 'আধুনিকতা'র (!) ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। গ্রামবাসী শহরকে জীবন নিয়ে খুব বেশি ভাবিতও না। তারা নিজেদের মতো থাকতে পছন্দ করে। যেহেতু তারা তাদের সমাজে অনুশীলিত বিভিন্ন রীতি ও আচারনিষ্ঠতা দিয়ে নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সহজ সমাধানে সক্ষম তাই তারা অচিন/অজানা কোন কিছুতে সহজে বিশ্বাস রাখতে চায়না এবং সেভাবে অভ্যস্ত না।

গিয়ার্জ তাঁর মূল আলোচনায় সংস্কৃতির নিখুঁত উপস্থাপনে বিশদ বর্ণনা (thick description) থাকা একান্ত বাঞ্চনীয় বলে জ্ঞান করেছেন। বিভিন্ন সহজ-সরল সমাজের গবেষণা পরিচালনায় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি সমাজ-সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। তার আলোচনায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রিচুয়্যাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূলত: স্থানিক জ্ঞানই প্রধান্য পেয়েছে। The Interpretation of culture (১৯৭৩) এ তিনি মুখ্যত স্থানিক জ্ঞান ও স্থানীয়দের ভাষার ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি সংস্কৃতির রূপায়নে কাছের ও দূরের অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে আনবার ওপর গুরুত্ব দেন। স্থানীয়দের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়াই হবে গবেষকের মূল কর্তব্য।

লোকজ জ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়ে কোন সমাজের ও সংস্কৃতির অর্ন্তনিহিত সত্যকে অনুসন্ধানের উপর জোর দিয়েছেন ব্রোকেনশাহ (১৯৮০)। Indigenous Knowledge system এরই একটি ধারাবাহিক নতুন কার্যকর প্যারাডাইম। যেখানে স্থানীয়দের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ সমাজের উন্নয়নে নৃবিজ্ঞনীদের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লোকজ সংস্কৃতির ভিত্তিতে কোন সমাজের সমস্যা ও তার সমাধান চিহ্নিত করে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rulal Appraisal-PRA) পদ্ধতি প্রয়োগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

চ্যাম্বারস্ (১৯৮২) স্থানীয়দের সঙ্গে নিবিড় ভাবে একাত্নতার মাধ্যমে তাদের অংশিদারীত্বকে নিশ্চিত ও কার্যকর করার প্রয়োজনীতার ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। লোর Capturing Traditional Environmental Knowledge (1992) শীর্ষক গ্রন্থে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বচন, গাঁথা, প্রবাদ, ইত্যাদি বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে একটি সনাতনী সমাজের ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন থেকে পুঞ্জিভূত জ্ঞান আহরণের গুরুত্বের অবতারণা করেন। এ মূল্যবান গ্রন্থে তিনি আফ্রিকান, এশিয়ান এবং অষ্ট্রেলিয়াব বিভিন্ন জনপদে বচন, প্রবাদ বিশ্লেষণপূর্বক দেখিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের গ্রামীণ সমাজের অনেক মূল্যবান জীবন ও জগত সর্ম্পকে অভিজ্ঞতা রয়েছে। যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এ লোকজ জ্ঞানকে উৎস ধরে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত রয়েছে এ কারণে তিনি এ ধরনের বিশ্বাস ব্যবস্থাকে Folk Wisdom বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্য সমস্যা একটি মানব সর্বজনীন বিষয়। কেউ এটি থেকে দূরে থাকতে পারে না। ছোট বড় সকলেই রোগ ব্যাধিতে ভূগে। রোগ-ব্যাধি কেবলই একটি শরীরবৃত্তীয় বিষয় না, এর সাথে পরিবেশ ও সংস্কৃতির একটি যোগসূত্র রয়েছে। চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান স্বাস্থ্য বিষয়টি অধ্যায়নে সংস্কৃতি ও পরিবেশকে পৃথক করে দেখে না। তাই রোগ-ব্যাধি ও এর প্রতিকার ব্যবস্থার সাথে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত উপাদান বিশেষভাবে জড়িত। চৌধুরী (১৯৮১) উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান ও চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রতিবেশের ওপর গুরুত্ব দেয়। তাঁর মতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব বিদ্যমান। কিছু কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন পুষ্টিহীনতা, জ্বর, সর্দিকাশি, গর্ভকালীন প্রভৃতি সমস্যাকে গ্রামবাসী সমস্যা বা রোগ বলে মনে করে না। মেলোনী, আজিজ ও সরকার (১৯৮১) এর মতে, গর্ভাবস্থাকে ভাবা হয় শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সকল ক্ষেত্রে তারা খুব বেশি অসুবিধার সম্মুখীন না হলে চিকিৎসা ছাড়াই দিন কাটায়। সহ্যসীমা অতিক্রম করলে প্রথমত তারা Home therapy নেয় অর্থাৎ বয়স্কদের দ্বারস্থ হয়। মা, দাদা, দাদির, পরমর্শ নিয়ে বাড়ীর আশেপাশের জঙ্গল থেকে লতা পাতা সংগ্রহ করে চিকিৎসা নেয়। এতে না সারলে কবিরাজ এর শরণাপন্ন হয়। ইভান উলফারস (১৯৮৯) উল্লেখ করেন শ্রীলংকায় স্থানীয় এবং আধুনিক উভয় চিকিৎসা পদ্ধতি সহজলভ্য। তা সত্ত্বেও মানুষ চিকিৎসক নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করে তা হলো প্রবেশযোগ্যতা, ব্যয়, চিকিৎসকের সুনাম, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে এসকল বিষয়ের বিবেচনায় লোকজন লোকজ চিকিৎসার প্রতি বেশি নির্ভরশীল।

২.২ গবেষণা এলাকা, গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি একটি গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে রচিত। গবেষণাকর্মটি ২০০০ সালে ফেনী জেলার একটি গ্রামে (চর চান্দিয়া) নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে সম্পাদিত হয়েছে। গ্রামটি প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি দারিদ্র্যপীড়িত লোকালয় এবং যেটির অবস্থান শহর থেকে দূরে। গবেষণার জন্যে গ্রামটি বেছে নেওয়ার কারণ হলো, পূর্ব পরিচিত বলে এখানে আমার সহজে প্রবেশ সম্ভব, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার পূর্বজ্ঞান রয়েছে এবং উক্ত গ্রামটিকে লোকজ জ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলনও রয়েছে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে লোকজনের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে লোকজ জ্ঞান এর ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এই ক্ষেত্রে তাদো মনোভাব অবহিত হওয়া। মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধেশ্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে রোগপ্রতিকারের জন্যে কী ধরনের লোকজ জ্ঞানভিত্তিক পরিবেশের উপাদান ব্যবহৃত হয় তার ধরন ও গাছ-গাছালির বিবরণ নির্ণয়, এই বিশ্বাস ব্যবস্থার স্থানীয়দের নিজস্ব যৌক্তিকতা ও মনোভাব যাচাই, ঔষধ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস নিরূপণ, এবং কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয় তা নিরূপণ করা।

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, প্রধান তথ্যদাতা কৌশল ও কেসস্টাডি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে নির্বাচিত এলাকা সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ ও গ্রামবাসীর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামের পরিবেশ, জনগোষ্ঠীর পেশা, অর্থনীতি, সমাজকাঠামো, প্রথা, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এক্ষেত্রে প্রধান তথ্যদাতার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এরপর অর্জিত তথ্য ও ধারণার প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণার সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি ত্রিশ জন ঔষধ ব্যবহারকারী ও পাঁচজন চিকিৎসককে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করেছি। নির্বাচিত তথ্যদাতাদের বাইরেও কিছুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সাথে কথোপকথনে অংশ নেই। এদের মধ্যে যারা কখনো এইরূপ চিকিৎসাসেবা গ্রহণ

করেনি তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথ্যদাতাগণ প্রধানত চল্লিশোর্ধ ব্যক্তি ছিলেন; যেহেত এই চিকিৎসা পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে লোকমুখে একে অন্যের কাছ থেকে শুনে আসার ফলশ্রুতি তাই বয়স্ক লোকদের নিকট থেকে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তথ্যদতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিবেশে কথোপকথন ও মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই কৌশল উত্তরদাতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নৈকট্য সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহযোগী ছিল। এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিচেনা করা হয়। উত্তরদাতাগণ যে তথ্য দেন তার সাথে কখনো কখনো বাস্ত বতার অমিল লক্ষ্য করা যায়। কথপোকথনের সময় তাদের আচরণের প্রকাশভঙ্গি, চারপাশের পরিবেশ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা নিরূপণ সহজতর ও সম্ভব হয়েছে।

২.৩ গ্রামীণ সমাজ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

গবেষিত গ্রামটি একটি দরিদ্র ও শিক্ষাদীক্ষাহীন এলাকা হিসেবে পরিচিত। শহর থেকে এর দূরত্ব বেশি হওয়ায় এখানে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দারুণ অভাব। শহরের সাথে এর পার্থক্য কেবল অবকাঠামোগতই নয় বরং মনমানসিকতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ প্রভৃতিতেও প্রকটরূপে লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র, কৃষক এবং আধুনিক জ্ঞানহীন। বংশ পরম্পরায় গ্রামীণ জীবনের সাথে শহরের যোগাযোগ হয় না বললেই চলে। মামলা মকদ্দমার কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে তারা সাধারণতঃ শহরে যাওয়া আসা করে না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রামের জনগোষ্ঠী উদাসীন। তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে না। নলকূপ থাকলেও তারা রান্নার কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করে। একই পানিতে তারা গোসল, গো-গোসল, গরুর জন্যে ঘাস পরিস্কার, সাবান দ্বারা ধোয়া ইত্যাদি কাজ করে থাকে। খুব কম বাড়িতেই স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেই দেখা যায়। অধিকাংশ বাড়িতেই লোকজন জঙ্গলে বা খাল- বিলে মল ত্যাগ করে থাকে এবং শিশুরা যেখানে সেখানে মলত্যাগ করে। মলত্যাগের পর খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা সাবান বা ছাই ব্যবহার করে। বাড়ির আশেপাশের জঙ্গল থাকে অপরিচ্ছন্ন, ফলে মশা মাছির উপদ্রব চোখে পড়ে। তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে মোটেও চিন্তিত না। রোগব্যাধিকে তারা জীবনের একটি অনিবার্য অংশ মনে করে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালীতে রয়েছে তাদের অনীহা। এছাড়া শহর থেকে গ্রামের দূরবর্তী অবস্থানের কারণে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার যেমনি অভাব রয়েছে তেমনি অভাব রয়েছে আধুনিক শিক্ষা ও অনুশীলনের। কেবল শিক্ষাই নয় তাদের রয়েছে দারুণ অর্থোভাব। স্বাস্থ্য

পরিচর্যার বিষয়টি যেহেতু বহুমাত্রিক বিষয়ের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত এর অর্ন্তপ্রবিষ্ট রয়েছে নানাবিধ প্রভাবক, তাই গ্রামীণ সমাজ জীবন তথা গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যবিষয়ক ভাবনাচিন্তা যুগযুগান্তরের প্রবহমান সংস্কৃতিরই অনুশীলন। আধুনিক চিকিৎসার অভাব, শিক্ষাভাব, অর্থনীতি ইত্যাদি এই ধরনের মনস্কতা তথা স্বাস্থ্যবিষয়ক ঔদাসীন্যতার অন্যতম কারণ।

৩.১ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার স্বরূপ

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে রোগব্যাধির প্রকোপ অধিক হওয়া সত্ত্বেও রোগ নিরাময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। 'আধুনিক' চিকিৎসা গ্রামাঞ্চলে অপ্রতুল। এই গবেষণায় লোকজ চিকিৎসাপ্রণালীর মধ্যে গাছ-গাছালির ব্যবহার সংক্রান্ত অনুশীলনকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, গ্রামপ্রধান গ্রামবাংলায় প্রকৃতিস্থ উপাদানের যেমনি আধিক্য রয়েছে তেমনি জনগোষ্ঠীর সর্বপ্রকার জীবনযাত্রার সাথে রায়েছে এর আন্তঃঘনিষ্ঠতা। চাষাবাদ, ফসল উৎপাদন, বনাঞ্চল, গাছপালা ইত্যাদি গ্রামীণজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত বলে গ্রামবাসী অতিস্বজন এই সকল উপাদানের মাঝে নৈকট্য ও বিশ্বাস খুঁজে ফেরে। জীবন বাঁচাতে ও সাজাতে এই সকল উপাদানের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। অতি সহজলভ্য প্রাকৃতিক গাছ-গাছালির মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় রোগব্যাধির ক্ষেত্রে গ্রামবাসী সমাধান পেয়ে আসছে বলে এই চিকিৎসার প্রতি রয়েছে তাদের চিরায়ত বিশ্বাস। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'আধুনিক' চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে না থাকায় এবং গবেষিত গ্রামের জনগণ অতি দরিদ্র ও অল্প-'শিক্ষত' হওয়ার কারণে এবং/কিংবা স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাবের কারণে ঔষধি বৃক্ষভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণে তারা বিশি আগ্রহী। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই কেউ কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে পরিবেশের উপাদান যেমন, গাছপালার শেকড়, পাতা ইত্যাদি থেকে অনেক রোগের চিকিৎসা করার প্রথা চালু রয়েছে। গাছ-গাছালির ঔষধিমানের জ্ঞান সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, নিম গাছের পাতা চুলকানি, ঘা, দাঁতের বিভিন্ন রোগসহ বহু রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ লোকজ জ্ঞান (Indigenous knowledge) পরিবেশ থেকে অর্জিত এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত। গ্রামের সহজ সরল মানুষ তাদের রোগব্যাধির ক্ষেত্রে স্থানীয়দের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য বিষয়ে তারা সচেতন না। তারা মনে করে রোগব্যাধি জীবনের একটি অংশ এবং

কোন কোন রোগকে তার সর্বদা রোগ বলেও মনে করে না। আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণেও রয়েছে তাদের অনীহা। তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তাদের মত সহজ সরল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে পর্যাপ্তও নয়। তারা রোগব্যাধিতে পরিবারের বয়স্ক কারো পরামর্শ নিয়ে থাকে। গ্রামের মানুষ বিচিত্র চিকিৎসার ধরন থেকে যে কোন পদ্ধতি বেছে নিতে বেশ কিছু প্রভাবক দ্বারা পরিচালিত হয় যেমন, তার সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসা সেবায় তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও মর্যদাগত অবস্থান, পদ্ধতি সম্পর্কে তার বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রোগের কারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, তার ধর্মীয় অবস্থান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি।

৩.২ প্রধান প্রধান রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্য সমস্যা

বিদ্যাজাগতিক শিক্ষা, দারিদ্র্যতা, স্বাস্থ্য বিষয়ে অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে গ্রামাঞ্চলের লোকদের মাঝে রোগব্যাধি লেগেই থাকে। গ্রামবাসীও রোগব্যাধিকে ততোটা গুরুত্ব দেয় না। গ্রামাঞ্চলে যে সকল রোগব্যাধি ও স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দেয় সেগুলোর মধ্যে অপুষ্টি, কৃমি, সর্দিকাশি, আমাশয়, জ্বর, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কফ, খাজলী, চুলকানি, বাত, দাদ, মেচতা, রাতকানা, অনিয়মিত ও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, গর্ভকালীন সমস্যা, যৌন সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তারা নেয়না বা জানেনা বললেই চলে। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো।

সাধারণ রোগব্যাধি

কফ কাশি (কুকাশ) হলে বাসক পাতা কিংবা তুলশী পাতার রস দুই-তিন দিন সেবন করা রীতি এখানে প্রচলিত। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, হিন্দুদের পুঁজোয় ব্যবহৃত হয় বিধায় তুলসী পাতা তাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং "পবিত্র" বলে বিবেচিত এবং সেইরূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া হলে নিমপাতার রস ৫/৬ দিন ভোরে খালি পেটে খেতে দেওয়া হয় অথবা ২/৪ দিন ৫/৭ ফোঁটা রসুনের রস খেলেও এ রোগ সেরে যায়। টাইফয়েড রোগের ক্ষেত্রে আধাপাকা বা কাঁচা তরমুজের রস ঘন ঘন খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। কেউ কেউ অবশ্য তালের ডোগার রস মধুসহযোগে খেয়েও উপকৃত গতে দেখ্ যায়। উদরাময় রোগটি গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। প্রায় প্রত্যেকেরই এ রোগের অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রতি বছর গ্রামদেশে এ রোগের কারণে বহুলোকের প্রাণহানী ঘটে। উদরাময় বা ডায়রিয়া হলে আম বীজের শাঁসের ক্বাথ আদার রসের সাথে খেতে হয়। আম গাছের ছালের উপরের স্তরটা ছেঁচে ফেলে দিয়ে সেই ছাল দইয়ের

(গরুর দুধের তৈরি) সাথে বেটে খেলে পায়খানা বন্ধ হয়। খুব বেশি পাতলাপায়খানা হলে (অনিয়ন্ত্রিত হলে) তখন নাভীর চারিদিকে একটু শক্তকরে আমলকি বেটে আইল (boundary) দিয়ে তার মাঝে আদার রস ভেজানো নেকড়া দেওয়া হয় এবং অত:পর রস খেতে দেওয়া হয়।

উদরাময় রোগীকে পানি, বার্লি, ফলের রস ইত্যাদি তরল খাবার দেওয়ার বিজ্ঞানও রয়েছে। এ সময় ডাবের পানি অত্যন্ত ভালো পানীয়। রোগের শেষ দিকে নরম খাবারও দেওয়া হয়। মৃগীরোগ এর বেলায় থানকুনি পাতার রস লাল চন্দন পাতা ঘষে কপালে লেপ দেওয়া হয় এবং কালো তুলশী পাতার রস ঠান্ডা পানি সহযোগে কয়েক ফোঁটা খাওয়ানো হয়। এবং ঐ মুহূর্তে চোখে মুখে ঠান্ডা পানি ছিটানো হয়। হাঁপানি হলে কালজিরা নেকড়াতে নিয়ে শ্বাস দিতে দেওয়া হয়। কেউ কেউ বাসক পাতাকে শুকিয়ে সিগারেট বানিয়ে টানে, এতে রোগমুক্তির উদাহরণ রয়েছে। আবার হলুদ গুড়ো, আখের গুড়, খাঁটি সরিষার তেল মিশিয়ে চাটলে শ্বাস কষ্ট হ্রাস পায়। জ্বর- যে কোন রকমের জ্বরে আদা ও তুলশি পাতার রস খেলে উপশম হয়। সিদ্ধ ছোলার ডালের উপরকার পাতলা পানি বিশেষ উপকারী। ম্যালেরিয়া জ্বরে ৫/৭ ফোঁটা রসুনের সাথে ১ চা চামচ ঘি মিশিয়ে খেলে ২/৪ দিনেই জ্বর ছেড়ে দেয়। এছাড়া লেবুর রস ও গরম পানির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে উপকারী।

উকুন/খুসকি হলে বেতো শাকের রস আধপোয়া, তিলের তেল তিন পোয়া ও পানি চার সের (লিটার) মিশ্রণ শেষে মাথায় লাগালে মাথার উকুন, খুসকি ও চুলের গোড়ার চাপড়া ঘা কয়েক দিনেই সেরে যায়। এছাড়া পেঁপের আঠা ১ চামচ, ৭/৮ চামচ পানিতে ফুটিয়ে চুলের গোড়ায় লাগিয়ে খানিকক্ষণ রাখার পর মাথা ধুয়ে ফেলা হয়। এভাবে ১ দিন পর পর আরও ২/৩ দিন লাগালে উকুনের উৎপাত বন্ধ হয়। ঘামাচি হলে দুর্বা বেটে গায়ে মাখানো হয় এবং ফলে ক্রমশ: চুলকানি ও ঘামাচি হ্রাস পায়। তেজপাতার বাটা গায়ে মেখে ঘন্টাখানেক রাখার পর গোসল করে ফেললেও ঘামাচি কমে যায়। ব্রণের ক্ষেত্রে ছোলা ভিজিয়ে বেটে মুখে মাখানো হয়। এতে ব্রণ ও মেছতাও কমে যায়। লতানো বেলী ফুলের পাতার রস দিনে দুইবার মুখে মাখলে ব্রণ বন্ধ হয়। জন্ডিস- ২৫/৩০ ফোঁটা নিম পাতার রস একটু মধু মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেতে দেওয়া হয়। প্রথমাবস্থায় লাউ এর পাতা খাওয়ালে ৫/৬ দিনে রোগী সতেজ অনুভব করে।

যৌন রোগ-গনোরিয়ার বেলায় পুরুষ লজ্জাবতির (সাদা) রসের ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। শিমূল গাছের মূল ও কেয়া কাটার মূল রোদের তাপে শুকিয়ে

ঢেঁকিতে গুড়ো করে পাউডার করে অনুমান করে গরুর দুধ, মিসরি, মধু ও নানান মসলা মিশ্রণ করে ২১ দিন খালি পেটে ভোরে ভোরে খেতে দেওয়া হয়। নিয়মিত সেবন করলে অতিসহজেই উপকারপাওয়া যায়। ছোলা ভেজানো পানিও এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী বলে বিচেিত।

মহিলাদের রোগ

রোগ-ব্যাধি সকলের হলেও মহিলারা তাদের রোগের কথা কম জানাতে চায়। এমনকি তাদের স্বামীর কাছে পর্যন্ত তা গোপন রাখে। ফলে চিকিৎসক এর কাছে তাদের যাওয়া কম হয়ে থাকে। বাড়ির বয়স্ক মহিলাদের পরামর্শ নিয়েই তারা রোগ সারাতে চেষ্টা করে, না সারলে স্বামী বা পিতার সাথে চিকিৎসকের কাছে গেলেও সমস্যার কথা নিজেরাই চিকিৎসক এর কাছে বলতে পারে না। এক্ষেত্রে চিকিৎসক কেবল পুরুষদের সাথেই সরাসরি কথা বলে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। চিকিৎসক স্থানীয় বলে রোগীদের সম্পর্কে তাঁর পূর্বধারণা থাকে এবং সেজন্যে রোগীদের বিষয়ে চিকিৎসা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে তিনি তাদের জীবনের সকল সম্পর্কের বিবেচনায় বিশেষ করে শরীরতত্ত্ব ও মনোস্তত্ত্বের নির্মাণ করে জীবনঘনিষ্ঠ সমাধানে আসতে পারে।

মহিলাদের একটি বিশেষ রোগ হলো অনিয়মিত ঋতুর সমস্যায়। অনিয়মিত ঋতুর সমস্যায় থানকুনি পাতার রস কিছুদিন খেলে ভালো হয়। অনিয়মিত, স্বল্প বা অধিক স্রাবের জন্যে ঋতু হওয়ার ৫/৭ দিন পূর্বে কালজিরা সামান্য গরম পানির সাথে সকালে ও বিকেলে খেতে দেওয়া হয়। ঋতু বন্ধ/হঠাৎ ঋতু বন্ধ হয়ে গেলে দারুচিনির গুড়ো পানিতে সিদ্ধ করে খেলে কিছুদিনের মধ্যেই ঋতু শুরু হয়। এক্ষেত্রে পেঁপের বীজের গুড়ো সকালে ও বিকেলে দু'বেলা খেতে দেওয়া হয়।

শিশুদের রোগবিশেষ

কৃমি শিশুদের একটি মাধারণ রোগ। কৃমি হলে আনারসের অগ্রাংশ (ডিগি) বা সুপারী গাছের শিকড়ের রস খাওয়ানোর মাধ্যমে সুফল পাওয়া যায়। হাঁপানি হলে মুক্তোঝুরির পাতার রস আর পুরনো ঘি মিশিয়ে অল্প গরম করে আস্তে আস্তে বুকে মালিশ করতে হয়। সর্দি হলে বা শ্বাস কষ্ট হলে মোচ্ছানী পাতা মাথার দুবদুবির ওপর (উপরের মাঝখান বরারবর) বসিয়ে দিতে হয়। এ পাতা মাথা থেকে পানি টেনে নেয়। নিম পাতা দিয়ে বাতাসও করার প্রচলন দেখা যায়। শ্বাসকষ্ট বেশি হলে গলায় পেঁয়াজের মালাও পরানো হয়।

রোগব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় তা হলো, একই রোগের জন্যে যেমনি একাধিক গাছপালা বা লতাপাতার ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি বিশেষ কোন গাছ বা লতাবিশেষের রয়েছে একাধিক ব্যাধির প্রতিকার ক্ষমতা বা ঔষধি গুণাগুণ। যেমন, নিম পাতার হাজার রকমের ঔষধি ব্যবহার রয়েছে বলে আবহমান কাল ধরে গ্রামাঞ্চলে বাড়ি-ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে এই গাছ রোপণ করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, দক্ষিণা বাতাসের সাথে নিমের ছোঁয়া মানুষকে রোগব্যাধি থেকে দূরে রাখবে। খোঁস-পাচড়া, চর্মরোগ থেকে শুরু করে ডেঙ্গুরোগের জীবাণুবাহী মশা তাড়ানো পর্যন্ত নিমগাছের ফুল, পাতা দিয়ে সম্ভব। এগাছের পাতা ও ছাল বেটে লাগালে খোঁস-পাচড়া ভালো হয়। পাতা, ও ছাল প্রকৃয়াজাত করে ব্যবহার করলে চর্মরোগ ও যৌনরোগে ভালো উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া, নিমগাছ বহুমূত্র, রক্তের বিকৃতি, কাশি, কৃমি, কুষ্ঠ, পিত্ত ও যকৃতের রোগ নিবারণে ব্যবহার করা হয়। নিমগাছের পাতা এনে ঘরে রেখে দিলে ওই স্থানে মশা প্রবেশ করেনা। নিমগাছের পাতা শুকিয়ে খোলায় ভেজে গুড়ো করলে তা একটি ভালো দাঁতের মাজন। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে নিম গাছের ছায়াও অতি উত্তম। নিম ফুলের গন্ধ পোকা দমনে সহায়ক। পথের দ্বারের দুর্বাঘাসেরও রয়েছে বৈচিত্র্যময় গুণাগুণ। ভেষজ ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার সুদূরপ্রসারী। যেমন, দুর্বাঘাসের রস টাক মাথায় সেবন করলে চুল ওঠা শুরু হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে সাথে সাথে দুর্বাঘাস পিষে লাগিয়ে দিলে উপশম হয়। রক্তপিন্ডে দুর্বাঘাস মহাষৌধ। এরোগে মুখ, নাক, ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে রক্তস্রাব হতে পারে। এক্ষেত্রে দুর্বার রসের সাথে কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাওয়ালে উপশম হয়। শরীরে বাত থাকলেও এটির বহুল ব্যবহার হয়। দুর্বাঘাস সন্তান ধারণে ব্যর্থ দম্পতিদের জন্যেও সম্ভাবনাময় ঔষুধ। গর্ভধারণে অসমর্থ হলে অথবা মৃতবৎসা হলে দুর্বা ও আতপ চাল এক সঙ্গে বেটে সপ্তায় তিন চারদিন খেতে দেওয়া হয়। ভাত খাওয়ার সময়ও এ ঔষুধটি খেতে দেওয়া হয়। শরীরের রেচনতন্ত্রেও স্বাভাবিকতা আনতে সাহায্য করে। প্রস্রাব হতে কষ্ট হলে দুর্বার রস ও দুধ মিশিয়ে গুড়ো করে তা দিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া সেরে যায়। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী আমাশয় নিবারণেও দুর্বাঘাস ব্যবহৃত হয়।

৩.৩ উৎসস্থল ও সংগ্রহ কৌশল

ঔষধিবৃক্ষ বা লতাগুল্মোর অধিক হারে ব্যবহারের একটি বিশেষ কারণ হলো সহজপ্রাপ্যতা। গ্রামদেশে প্রায় প্রতিটি বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড়ে ঔষধি গাছ এর সন্ধান মেলে। এছাড়া কবরস্থান ও শ্মশান ঔষধি গাছের প্রধান উৎস। কবর ও

শ্মশান খুববেশি জীবন-ঘনিষ্ঠ (মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত) বলে ঐ স্থানের গাছ/লতাগুল্ম বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। রাস্তার পাশেও এরূপ লতা, পাতা ও বৃক্ষরাজির সন্ধান পাওয়া যায়। উৎসস্থল যেখানেই হোক না কেন, যে কারো কাজের জন্যে তা উন্মুক্ত থাকে (share and care)। কারণ কোন বাড়িতেই সকল ব্যাধির ঔষধি গাছ পাওয়া যায়না। তাই এক অন্যকে সাহায্য করতে হয়। তবে প্রায় সকলের বাড়িতেই সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত লতাগুল্ম বা গাছগাছালি থাকে। এই গাছগাছালি কেবলমাত্র ঔষুধ হিসেবেই ব্যবহার্য নয় এগুলোর রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার। গাছের ছাল বা লতা বা মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিশেষ দিনক্ষণ মেনে চলা হয়; যেমন, শনি ও মঙ্গল বারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো ভোর রাতে সংগৃহীত হয়। লতা-পাতা সংগ্রহ করার প্রাক্কালে সংগ্রহকারীকে বিশেষ পবিত্রতা অবলম্বন করতে হয়, যেমন, স্নান করা। যে সব ক্ষেত্রে ঔষধি গাছগাছালি বাড়ির সীমানা/আশেপাশের জঙ্গল/কবরস্থান/শ্মশানে পাওয়া যায় না সেসকল ক্ষেত্রে রোগীকে অবশ্যম্ভাবীরূপে কবিরাজ এর শরাণপন্ন হতে হয়। এবং সাধারণত গ্রামের লোকজন এইসব ক্ষেত্রে কবিরাজের দ্বারস্থ হয়, নতুবা চিকিৎসা নিজেরা নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকে। গ্রামীণ কবিরাজগণ দুষ্প্রাপ্য লতাগুল্ম রোগের প্রকোপ ও মৌসুম বিচার করে দূর দূরান্ত থেকে সংগ্রহ করে রাখে এবং ঔষুধ ('পথ্য') তৈরি করে রাখে।

৪.১ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও লোকজ চিকিৎসা

চর চান্দিয়া গ্রামে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, পানিপড়া ও কবিরাজি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত। এগুলোর মধ্যে কবিরাজি পদ্ধতি সবচে' বেশি প্রচলিত। যারা গাছপালা, লতা-পাতার মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পন্ন করে থাকে তাদের গ্রামবাসী কবিরাজ বলে থাকে। গ্রামবাসী রোগব্যাধিতে প্রথমত নিজেরাই চিকিৎসা নিয়ে থাকে। সুস্থ না হলে তারা করিবরাজের শরণাপন্ন হয়। পূর্বে প্রায় সকল রোগের ক্ষেত্রেই গ্রামের মানুষ কবিরাজ এর শরণাপন্ন হতো কিন্তু বর্তমানে বড় বড় রোগব্যাধি হলে তারা হাসপাতালে যায়। বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও অধিকাংশ গ্রামবাসীই রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে লোকজ চিকিৎসাকে বেছে নেয়।

জন্মের শুরু থেকে মৃত্যু অব্দি তারা গাছ-গাছালি, লতা-পাতার ব্যবহার করে বলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা মানুষের অনেক দিনের, বিশেষ করে এটা গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে সর্বত্র মানব সমাজ

গাছ-গাছড়া ও লতা-পাতা ব্যবহার করে আসছে। সৃষ্টির পর থেকে প্রকৃতির ওপর অতিনির্ভরতা এবং প্রকৃতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে মানব সমাজ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এবং সেই থেকে মানুষ যে কোন সমস্যায় প্রকৃতির কাছে সমাধান চেয়েছে। রোগব্যাধির ক্ষেত্রেও এর থেকে ব্যাতিক্রম নয়। কারণ মানুষ যখন অসহায় ছিল প্রকৃতির এ সমস্ত উপদান তার কাছে সহজলভ্য ছিল। গাছ-পালার ফল-মূলই তার আদি খাবার, যার মধ্যে সে ব্যাধির চিকিৎসা করে উপকৃত হয়েছে। সেই উপকৃত হওয়াব অভিজ্ঞতার কথা মানুষ একে অপরের সাথে শেয়ার করেছে। একে অন্যের ব্যাধিতে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা কিংবা শোনা জ্ঞানকে গ্রামবাসী আজও তাদের বংশধরদের মাঝে 'রুসুম'(রীতি) মোতাবেক চালু রেখেছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাগত জটিলতা, ডাক্তারের সাথে আন্ত :ক্রিয়ার সমস্যা, খরচাপাতির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব এবং প্রবল বিশ্বাস ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে লোকজ জ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলন গ্রামাঞ্চলে আজও প্রকট।

অধিকাংশ গ্রামবাসী শহরের শিক্ষিত চিকিৎসক এর কাছে যেতে ভয় পায় কারণ হিসেবে চিকিৎসক এর সাথে তাদের আর্থিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব অনেক বেশি বলে তারা মনে করে। ডাক্তার এর ফি দিয়ে চিকিৎসা নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া সরকারি হাসপাতাল গ্রাম হতে দূরে বলে সেখানে যাওয়া হয় না বিধায় তারা এলাকার চিকিৎসকদের শরাণাপন্ন হয়। সাধারণত: গ্রামের সকল মানুষই লোকজ চিকিৎসাপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তবু রোগব্যাধির ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনানুভব করে স্থানীয় চিকিৎসকদের কাছে তাদের সমস্যা তুলে ধরে। এ চিকিৎসা নিতে যারা চিকিৎসকদের কাছে আসে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর। এছাড়া গ্রামের মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার, কখনো কখনো ধনী পরিবারের লোকজনও বিশ্বাসের কারণে ও দূরে যাওয়া এড়ানোর কারণে স্থানীয় কবিরাজ এর কাছে আসে। এমন কারো সাথে আমার কথা হয়নি যে কিনা জীবনে কখনোই লোকজ চিকিৎসা গ্রহণ করেনি। তথ্যদাতাদের মধ্যে বয়স্ক, দরিদ্র, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অশিক্ষিতরাই বেশি যারা এ চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে।

৪.২ লোকজ চিকিৎসা ঃ গ্রহণযোগ্যতা ও সেবাগ্রহণকারীদের মনোভাব

গ্রামবাসী তাদের যাবতীয় স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে লোকজ চিকিৎসাকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। তারা এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এর পেছনে অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে। যেমন, এ পদ্ধিতি তাদের সংস্কৃতির সাথে

মিশে আছে। যুগ যুগ ধরে তাদের পূর্ব পুরুষরা এ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের রোগ-ব্যাধি সেরে আসছে। তাছাড়া অতি অল্প কিংবা কখনো কখনো প্রায় বিনা খরচে এ সেবা মিলে বলে গ্রামের মানুষ এ চিকিৎসার প্রতি আগ্রহী। মানুষের কাছে এ চিকিৎসার প্রতি বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসও কাজ করে। যেমন: কয়েকজন তথ্যদাতার মতে, মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত অদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর আল্লাহ প্রকৃতির গাছপালা ইত্যাদির গুণাবলী হযরত আদম (আঃ) কে জনিয়েছেন। আবার হযরত সোলায়মান (আঃ) কে গাছপালা নিজ থেকেই ডেকে গাছের নাম ও ঔষধিগুণ সম্পর্কে জানাতো। সে থেকে মুসলিম মনীষীগণ গাছপালার মাধ্যমে রোগ প্রতিকারের চর্চা শুরু করেন। অপরদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কয়েকজনের মতে, হিন্দু ধর্মের চারটি ধর্মগ্রন্থের একটিতে (আয়ুর্বেদ) মণীষীগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে গাছপালার ঔষধি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে এ বিশ্বাস ব্যবস্থার একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে সহজ সরল ও ধর্মপরায়ণ গ্রামবাসী বলে মনে করে।

গ্রামদেশের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ির আশেপাশে পাওয়া যায় বলে এই সকল উপাদানের দ্রব্যগুণ সম্পর্কে কৃষিজীবি গ্রামবাসী পূর্ব থেকে জ্ঞাত থাকে। অতি সহজে নিজ থেকেই রোগ প্রতিকারে এগুলোর ব্যবহার করতে পারে বলে ছোট বেলা থেকেই এ চিকিৎসার প্রতি একটি বিশেষ বিশ্বাস গড়ে উঠে। আরেকটি বিষয় গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে যে, গাছ-গাছালি অত্যন্ত নির্ভেজাল এবং এর বহুবিদ গুণাবলী ব্যতীত কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। অপরদিকে বাজারে যে সকল ঔষধ পাওয়া যায় সেগুলো নির্ভেজাল না। বরং দামি, ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পন্ন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, স্বল্প আয়, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার সহজলভ্যতার অভাব, যথাযথ স্বাস্থ্যসচেতনতা ও জ্ঞানের অভাব ইত্যাদিও অবশ্য লোকজ চিকিৎসার প্রতি অনুকূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৪.৩ চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতার কারণ

গ্রাম বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত এবং ঐ চিরায়ত অনুশীলন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যার সহজ ও টেকসই সমাধানে বিশ্বাসী। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। এক্ষেত্রেও স্থানিক জ্ঞান তাদের নিত্যদিনকার চর্চার সঙ্গী। গবেষিত এলাকাতে গ্রামবাসী অত্যন্ত দুর্বিসহ জীবন যাপন করে, তারা আর্থিক ভাবে অসচ্ছল ও স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। তাদের বেশির ভাগই কৃষিজীবি। ভাতের সাথে তারা বিভিন্ন শাকসব্জি, লতা-পাতা

খেয়ে থাকে। বেশিরভাগ লোকই রোগব্যাধিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না। কারণ অতো গুরুত্ব দেওয়ার মতো মানসিক ও আর্থিক অবস্থা তাদের নেই। গবেষিত এলাকাতে কোন সরকারি হাসপাতাল ও ডাক্তার নেই। একমাত্র সরকারি হাসপাতালটি ৪ কিলোমিটার দূরে উপজেলা সদরে অবস্থিত, হাসপাতালটির অবস্থাও রুগ্নপ্রায়। তথাপি নিতান্তই কেউ ডাক্তার এর সাহায্য পেতে চাইলে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জেলা শহরে আসতে হয়, এবং সেদিন তাকে সকল কাজ বন্ধ রাখতে হয়। যোগাযোগ অবস্থার অসুবিধা ও আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তারা স্থানীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতেই সন্তুষ্ট থাকে। তাই আধুনিক চিকিৎসার দুস্প্রাপ্যতা, স্বাস্য সমস্যা ও রোগ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবের কারণে চিকিৎসাব্যবস্থা হিসেবে গ্রামবাসীর নিকট লোকজ জ্ঞানভিত্তিক গাছগাছালির ব্যবহার অধিক গ্রহণীয়।

উত্তরদাতারা মতামতের ভিত্তিতে লোকজ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করার নিম্নোক্ত কারণ চিহ্নিত করা যায়ঃ

১) বিভিন্ন ধরণের মূল্যেবোধ, বিশ্বাস, সংস্কারের কারণে তারা গাছপালা লতাপাতাকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে।
২) আধুনিক চিকিৎসার অভাব ও অজ্ঞতার কারণে মানুষ রোগব্যাধিতে লোকজ চিকিৎসা গ্রহণ করে।
৩) সরকারী ডাক্তারের অপ্রতুলতা ও ডাক্তারের সাথে আন্ত:ক্রিয়ার সমস্যা গ্রামবাসীদেরকে সরকারি আধুনিক চিকিৎসা থেকে সরিয়ে রাখে।
৪) দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও ভয় গ্রামবাসীদেরকে আধুনিক চিকিৎসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
৫) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে গ্রামবাসী লোকজ জ্ঞানকে বেশি মূল্য দেয়।
৬) প্রকৃতি ও পরিবেশ লোকজজ্ঞানের মাধ্যমে চিকিৎসার অনুকূলে অর্থাৎ সহজেই পরিবেশের উপাদান পাওয়া সম্ভব বলে গ্রামাঞ্চলে লোকজন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কবিরাজিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

আধুনিক ঔষধপত্র এবং উপাদান তাদের অজ্ঞাত থাকে। এছাড়া এগুলোর ব্যবহারবিধি তাদের নিকট সহজবোধ্য নয়। অধিকন্তু, ঐ সকল ঔষধপত্রকে তারা 'ঔষধ' না ভেবে 'মেডিসিন' বা 'কেমিক্যাল' ভাবতে অভ্যস্ত, যেগুলোর সাথে তারা নিজেদের ঠিক মেলাতে পারেনা। ঔষধের দামও নিতান্তই বেশি। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আধুনিক চিকিৎসাসেবা নিতে হলে চিকিৎকের শরণাপন্ন হতে

হবে যা নারী/পুরুষ সকল মহলের নিকট রীতিমতো অভাবনীয় বিষয়; এতে তারা অস্বস্তি বোধ করে। কারণ দারিদ্র্যতা ও শিক্ষার অভাব গ্রামবাসী এবং চিকিৎসকদের মধ্যকার দূরত্বকে প্রকট করেছে, এই দূরত্ব সহজেই অতিক্রম্য নয়। তাই নিজেদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ও পূর্বাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাড়ির আশপাশ থেকে প্রাপ্ত প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে লোকজ চিকিৎসাবিধির অনুশীলন করে থাকে।

৫. উপসংহার

এই প্রবন্ধে মূলত গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালী হিসেবে গাছগাছালির ব্যবহার তথা ঔষধিগাছের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লোকজ জ্ঞাননির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা বিধৃত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই উপসংহারে পৌঁছা যায় যে, লোকজ চিকিৎসা গ্রহণের বহুমাত্রিক কার্যকারণ রয়েছে। কেবলমাত্র বিশ্বাস কিংবা শিক্ষার/অর্থের অভাব নয় বরং ইত্যকার সকল আন্ত:সম্পর্কের ভেতরেই নিহিত রয়েছে এই চিকিৎসার প্রচলনবিধি। লোকজ চিকিৎসা গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, ও মূল্যবোধের সাথে ওতপ্রোতভাবেযুক্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিত্তবানদের মাঝেও বিশেষ বিশ্বাসের কারণে এই চিকিৎসা সেবা নিতে দেখাা যায়। এই বিশ্বাস গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ; জীবন ও জীবিকার পরম আত্মীয়।

গ্রামবাসী স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন না বলে বছরের বারটি মাস কোন না কোন রোগে ভূগে। তাছাড়া মহিলারা তাদের রোগ দেহের মাধ্যেই রেখে দেয়, মুক্তির পথ দেখাতে চায়না। গ্রামবাসী লোকজ চিকিৎসার প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে ফলে যে কোন সমস্যায় তারা এর মাধ্যমে মুক্তি পেতে প্রথমে নিজেরাই চেষ্টা করে, নিজেদের দ্বারা সম্ভব না হলে চিকিৎসকদের কাছে যায়, যাদের পেশাগত যোগ্যতা না থাকলেও অভ্যাসবশত ও শুনেশুনে এবিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফলে তারা গ্রামবাসীর রোগব্যাধিতে সেবা দিতে মোটামুটি সক্ষম। উচ্চ শিক্ষিত না হলেও সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই দ্রিদ্র বলে এবং চিকিৎসক ও সেবাগ্রহণকারীদের আন্তরিক সম্পর্কের কারণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনে কড়াকড়ি নেই। রোগ ও রোগী হিসেবে পারিতোষিক নেয়া হয়। স্বল্পব্যয়ে রোগমুক্তি সম্ভব বলে তারা 'অযথা' অন্য চিকিৎসার ঝুঁকি নিতে চায় না। লোকজন রোগ-ব্যাধির প্রতিকারে চিকিৎসকদের সকল পরামর্শ, নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে। অবশ্য "মানা" এর প্রকৃত কারণ তাদের জানা নেই

(অ্যানন,১৯৮৮)। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কৃষি এবং রোগব্যাধির ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে সমারোহে এ বিশেষ ব্যবস্থা টিকে আছে, অতিমাত্রায় কৃষির ওপর নির্ভরতার কারণে। এবং সেজন্যেই জীবন নির্বাহ ও জীবন সাজাতে তথা বাচাঁতে গাছপালার রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা যা আবহমান কাল ধরে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। আধুনিক চিকিৎসা সেবা গ্রামবাসীর নাগালের বাইরে তাই তারা আজও প্রাচীন চিকিৎসা ব্যাবস্থার বাইরে আসতে পারছে না। গ্রামের ধনী ও শিক্ষিত কিছু লোক আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করলেও অধিকাংশই ঐতিহ্যবাহী লোকজ চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল; যেহেতু স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও সমূলে এ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্তি সম্ভব তাই সরকার এ চিকিৎসা পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও বিস্তৃতকরনে সহায়তা করে গ্রামবাসীর রোগ-ব্যাধির প্রতিকারে সবিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে এটা নি:সন্দেহ। ঐতিহাসিকভাবে এটা আজ স্বীকৃত যে, ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় জৈব চিকিৎসাকে (bio-medicine) প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই এই লোকজ চিকিৎসাকে প্রান্তিকীকরণ (marginalization) করা হয়েছে (আখ্তার ২০০৪)। তাই আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে স্বয়ং লোকজ চিকিৎসার পরিচর্যার।

টীকা

১. আলোচিত প্রবন্ধটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণাকর্মের অংশবিশেষ। গবেষিত সমস্যাটি ব্যাপক, বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। তাই এই নিবদ্ধটি মূলত প্রাথমিক কিছু ধারণা দেওয়ার জন্যেই প্রণীত। বিষয়টি বহুমাত্রিক নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে।

২. এ নিবন্ধে সংগৃহীত বিভিন্ন বিশ্বাসব্যবস্থা যা জনশ্রুতিতে বহমান সে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অবলোকন করা হয়েছে।

৩. ঔষধি বৃক্ষবিধি বিষয়টি বর্তমানে বহুল আলোচিত ও গবেষণার বিষয় হিসেবে উত্তোরোত্তর প্রাধান্য পাচ্ছে।

-স্থানীয় জ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাপ্রথার ব্যবস্থাপনা দরিদ্র,অসহায় জনগোষ্ঠীর ভোগান্তি হ্রাস করবে।

-সরকারী ব্যবস্থাপনায় ঔষধিগাছ-গাছালি (medicinal plants) রোপণ ও এসংক্রান্ত সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

-আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ন্যায় লোকজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ প্রয়োজন।

-আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পরোক্ষভাবে লোকজ চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

-গবেষণার মাধ্যমে ভেষজ উদ্ভিদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে।

-বিকল্প ঔষুধের সন্ধানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

-ভেষজ বিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরিচিত করে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Ahmed, k. and Hasan (1983) Nutrition Survey of Rural Bangladesh 1981-82. Institute of Nutrition and Food Science. Dhaka.
2. Brokenshaw, D; Warren, D. M. and Werner, O. eds (1980) Indigenous Knowledge Systems and Development. Unniversity Press of America, USA.
3. Belshaw, C.S. (1974) The Contribution of Anthropology to Development. Current Anthropology, 15, 520-526
4. Choudhury, A. F. H. (1981) Culture, Environment and Disease (Unpublished)
5. Choudhury, A. F. H. (1986) Indigenous Knowledge System: A Development Paradigm in Anthropology Bangladesh Sociological Review Vol-I, No.1
6. Clifford, J. and Marcus, G. (1986) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography.Berkeley, University of California Press.
7. Geertz, Clifford (1973) Thick Description: Towards and Interpretive Theory.The Interpretation of Culture, London: Hutchinson.
8. Helman, C. G. (1994) Culture, Health and Illness. Reed Educational and Professional Publishing Ltd.
9. Hossain, Z and Choudhury, A. F. H. (1987) Folk Dietary Practices and Ethnophysiology of Pregnant Women in Rural Bangladesh. Southern Illionois University at Carbondale.U.S. A.
10. Kurin, Richard (1983) Indigenous Agronomics and Agricultural Development in Indus Basin. Human Organization, 42 (4): 283-294
11. Lore (1992) CapturingTraditional Environmental Knowledge. International Development Research Centre.
12. Mustafa, M. M. (1998) Towards An Uderstanding of Indigenous Knowledge (Unpublished).
13. Pitt, David C (1976) Development From Below: Anthropologists and Development Situations. Chicago: The Hague Mounton.
14. Scotch, N. A. (1963) Medical Anthropology in Seigal (eds) Biennial Review of Anthropology. Standford University Press.
15. Sumacher, E.F. (1973) Small is Beautiful. London: Glord and Griggs.

১৬. চৌধুরী, আহমেদ ফজলে হাসান (২০০৩) নৃবৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম রূপান্তরের ধারা ইনষ্টিটিউট অফ এ্যাপ্লায়েড এ্যানথ্রোপলজি, ঢাকা।

১৭. ফারহানা, সানজিদা (১৯৯৯) গ্রামীণ বাংলাদেশে সনাতনী জন্মসেবিকা: একটি নৃবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা, দি চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্স, উনিশতম ভলিউম।

১৮. আখ্‌তার, রাশেদা (২০০৩) উন্নয়ন ডিসকোর্সে ধাত্রীসেবার অনুশীল, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৮, ২০০৩ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

১৯ আখ্‌তার, রাশেদা (২০০৪) জৈব চিকিৎসার ঔপনিবেশিক বৈধতা ঃ একটি পর্যালোচনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত "Anthropology in the 21st Century" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে পঠিত (প্রকাশিতব্য)।

২০. হাফিজ, আবদুল (১৯৯৪) লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

২১. আলা উদ্দিন, মুহাম্মদ (২০০১) রোগব্যাধির চিকিৎসায় লোকজ জ্ঞান ঃ একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা (অপ্রকাশিত), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

২২. আলা উদ্দিন, মুহাম্মদ (২০০৩) লোকজ চিকিৎসাঃ একাট নৃবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, তৃণমূল উদ্যোগ, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৩ ।